দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ · 10 APR 2016 ··· ···
পৃষ্ঠা ··· ৬ ··· কলাম ··· ৬ ··· ······

স্কুলব্যাগ না মরণফাঁদ

শিশুদের যে বইয়ের বোঝা দেয়া উচিত নয় সেসব কথা সরকারের নীতিনির্ধারকগণ হরহামেশাই বলে থাকেন। সরকারীভাবেও পাঠক্রম পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু দিন দিন বই এবং বিষয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বৈষম্যটা কেমন তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুরা পড়ে মাত্র ৩টি বিষয়। পঞ্চম শ্রেণীতে শিশুরা পড়ে ৬টি বিষয়। সেই শিশু ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে ১৩টি বিষয়। যারা এসব বিষয় পাঠ্য করে তারা কি কখনও ভাবে যে, শিশুটির মেরুদণ্ডের জোর কতটা? এটিও কি তারা বুঝেন যে, এক বছরে সে কতটা বেশি গ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জন করে? এক বছরের ব্যবধানে একটি শিশুকে কি কোনভাবে নতুন সাতটি বিষয় পড়তে দেয়া যায়?

খবরটি বাংলাদেশের নিউজপোর্টালেও প্রকাশিত হয়েছে। ৬ এপ্রিল ২০১৬ তারিখের বাংলা মেইল২৪ডটকম পোর্টালের খবর হচ্ছে-'পিঠে ভারি স্কুলব্যাগ নিয়ে নিচে তাকাতে গিয়ে পাঁচতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে চার বছরের এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। শিশুর নাম সারিকা সিং। ভারতের মহারাষ্ট্রের নালাসোপারা ইস্টের অলকাপুরী এলাকায় ঘটনাটি ঘটেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, শিশু সারিকা সিং স্কুল থেকে ফিরে নিজের ফ্ল্যাটে যাচ্ছিল। সেই সময় কেউ তার নাম ধরে ডাক দেয়। তারপরই ব্যালকনি থেকে নিচের দিকে তাকায়। কিন্তু ভারি স্কুলব্যাগের ওজনে টাল সামলাতে না পেরে পাঁচতলা থেকে পড়ে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় এক বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। এদিকে পুলিশের ধারণা, ভারি ব্যাগের জন্যই ঝুঁকতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শিশুটি পড়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কিন্তু চার বছরের শিশুর পিঠে কি এত বইয়ের বোঝা চাপানো উচিত? দুর্ঘটনার পর এই প্রশ্ন আরও একবার সবার মুখে মুখে। বাংলাদেশের পোর্টালে প্রকাশিত এই খবরটির উৎস খুঁজতে আমরা গুগল থেকে 'ইন্ডিয়াটিভি নিউজ' খুঁজে পাই যেখানে বলা হয় যে, সারিকা পাঁচতলায় অবস্থিত তাদের বাসায় যাবার আগে চারতলায় তার প্রতিবেশীর তলায় থামে। পরে যখন সে তার নিজের বাসায় উঠতে যায় তখন সে সিঁড়ির ফাঁক দিয়ে নিচে কারা আছে তা দেখতে তাকালে সে তার শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এই ভারসাম্য হারানোর প্রধানতম কারণ হচ্ছে তার ভারি স্কুলব্যাগটি। ফলে সে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। এর পরপরই আতঙ্কিত বাসিন্দারা তাকে প্রথমে অ্যালিয়েন্স হাসপাতালে ও পরে ককিলাবেন আম্বানি হাসপাতালে নিয়ে যান যেখানে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। সারিকার বাবা দারা সিং রাজরিয়া তখন বাসায় ছিলেন না। তিনি কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। তুলিঞ্জ পুলিশ স্টেশনের সহকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর সুদর্শন পোদ্দার জানান যে, সারিকার দুটি বড় বোন ও একমাত্র বড় ভাই রয়েছে। তাদের ফ্ল্যাট নম্বর হচ্ছে ৪০৫। এলাকার বাসিন্দারা সারিকার মৃত্যুতে শোকার্ত। কারণ সে সকলেরই আদরের ছিল।

সেখানেই মেয়েটির ছবিও পাওয়া যায়। বাংলাদেশে অনেকেই তাদের খবরের সঙ্গে নিজেদের ছবি বা কেবল স্কুলব্যাগের ছবি প্রকাশ করেছেন। চার বছরের ইনোসেন্ট এই মেয়েটি বস্তুত সারা দুনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার দিকেই আঙুল তুলেছে। বিশ্বজুড়ে শিশুশ্রেণী থেকে ওপরের দিকে পড়তে যাওয়া সকল শিশুর জন্যই এমন ভারি স্কুলব্যাগ ব্যবহার করা হয়। শিশুর শারীরিক ওজন যাই হোক না কেন তাকে কখনও কখনও তার নিজের শরীরের ওজনের চাইতে বেশি ওজনের ব্যাগ বহন করতে হয়।

বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থায় স্কুলব্যাগ ব্যবহার করে বিশেষ করে শিশুদের যেভাবে নিপীড়ন করা হয় তার বিপরীতে কিভাবে ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা এর বিকল্প হতে পারে সেই বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে। এর আগে বিষয়টি নিয়ে আমি অনেক আলোচনাও করেছি। বাংলাদেশে শিক্ষাকে ডিজিটাল করার ক্ষেত্রে কি ধরনের দুর্বলতা বিরাজ করছে সেটিও ব্যাপকভাবেই আলোচনা করেছি। স্কুল ব্যাগের ওজন ও সেটি বহন করার বিষয়ে বাংলাদেশে প্রকাশিত একটি খবরকে কেন্দ্র করে আমার আলোচনাটি ছিল এর বিদ্যমান অবস্থা এবং আমাদের সরকারী প্রয়াস নিয়ে। আমরা প্রসঙ্গত একটু পেছনের দিকেও তাকাতে পারি।

“২০১৪ সালের নবেম্বরে ঢাকার জাতীয় দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় একটি শীর্ষ সংবাদ পরিবেশন করা হয়, যাতে বলা হয় যে, আমাদের শিশুদের স্কুলব্যাগটা বড্ড ভারি। তারা জরিপ করে দেখিয়েছে যে, ১৫-২০ কেজি ওজনের শিশুকে ৬ থেকে ৮ কেজি ওজনের স্কুলব্যাগ বহন করতে হয়। তারাই ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে বলেছে যে, শিশুর মোট ওজনের শতকরা দশ ভাগের বেশি ওজনের ব্যাগ তার কাঁধে দেয়া উচিত নয়। এর ফলে শিশু শারীরিকভাবে ব্যাপক ক্ষতির শিকার হতে পারে।”

আমরা এখন জানি যে, স্কুল ব্যাগের ওজন কেবল সমস্যা তৈরি করে না। ভারতের শিশু সারিকার মৃত্যু শারীরিক সমস্যার বাইরে জীবন সমাপ্ত হবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা নানা পরামর্শ দিয়ে বলেছে যে, শিশুর বই কমিয়ে, স্কুলে বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করে, খাতার পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে ব্যাগের ওজন কমানো যায়। প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে এসব চিন্তা-ভাবনা নিয়ে সামনে আগানো যেতে পারে। কিন্তু কার্যত শিশুদের বইয়ের ওজন, খাতার ওজন বা পানির বোতল কোনটাই কমবে না। বরং যদি ব্যাগটার ওজন আরও বাড়ে তবে তাতে আমাদের অবাক হবার কিছু থাকবে না। ফলে ব্যাগের ওজন বাড়ার এই সমস্যার সমাধানও তাই পাঠক্রম কমানোতে বা বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার পথে হবে না। আসুন অন্য কিছু ভাবি। এর বিকল্প কি হতে পারে সেটি নিয়ে চিন্তা করি। এই ভাবনাটি অবশ্য আমার জন্য একেবারেই নতুন নয়।

আমি স্মরণ করতে পারি, নব্বই দশকেও আমার সম্পাদিত নিপুণ পত্রিকায় শিশুদের ওজনদার স্কুল ব্যাগের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলাম। আমার শিশুকন্যা তন্বীর পিঠের ব্যাগটাকে প্রচ্ছদের ছবি বানিয়ে তার ওপরই প্রচ্ছদ কাহিনী করেছিলাম। তখনই প্রস্তাব করেছিলাম- শিশুদের যেন তথাকথিত বিদ্যার ওজনে পিষ্ট না করা হয়। তখনও দুনিয়াজুড়ে ডিজিটাল শিক্ষার প্রসার তেমনভাবে শুরু হয়নি। কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্লাসরুমে কম্পিউটার প্রচলনের সূচনা হয়েছিল। আমরা ঢাকায় তখনও ভাবতেই পারিনি যে, বইয়ের কোন বিকল্প হতে পারে। সেজন্য তখন আমি বিষয়টি মানবিক বিবেচনায় দেখার অনুরোধ করেছিলাম।

শিশুদের যে বইয়ের বোঝা দেয়া উচিত নয় সেসব কথা সরকারের নীতিনির্ধারকগণ হরহামেশাই বলে থাকেন। সরকারীভাবেও পাঠক্রম পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। কিন্তু দিন দিন বই এবং বিষয়ের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বৈষম্যটা কেমন তার একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেই বোঝা যাবে। আমাদের দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুরা পড়ে মাত্র ৩টি বিষয়। পঞ্চম শ্রেণীতে শিশুরা পড়ে ৬টি বিষয়। সেই শিশু ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে ১৩টি বিষয়। যারা এসব বিষয় পাঠ্য করে তারা কি কখনও ভাবে যে, শিশুটির মেরুদণ্ডের জোর কতটা? এটিও কি তারা বুঝেন যে, এক বছরে সে কতটা বেশি গ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জন করে? এক বছরের ব্যবধানে একটি শিশুকে কি কোনভাবে নতুন সাতটি বিষয় পড়তে দেয়া যায়? দুনিয়ার কোন শিক্ষা বিশেষজ্ঞ কি এমন পরামর্শ দিতে পারেন? দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের পণ্ডিতগণ সেই কাজটি করেছেন। শুধু কি তাই, পাঠক্রমে যে পরিমাণ বই বা পাঠক্রম আছে বেসরকারী, ইংরেজী মাধ্যম এমনকি মাদ্রাসারও বই বা পাঠক্রম তার চাইতে বহুগুণ বেশি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, কোন কোন বেসরকারী বিদ্যালয়ে শিশুশ্রেণীতেই দ্বিগুণ-তিনগুণ বই পড়ানো হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেকে কেবল বই থেকে কমিশন পাওয়া যাবে বলে নতুন নতুন বই পাঠ্য করে। প্রকাশকরা এসব বই পাঠ্য করার জন্য শতকরা ৭০ ভাগ অবধি কমিশন দিয়ে থাকে। অন্যদিকে স্কুলের মালিক ও শিক্ষকরা বলেন যে, অভিভাবকরাই চান যেন অনেক বই পাঠ্য করা হয়। একটি বিষয়কে দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। সরকার দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজী শেখার জন্য একটি বই পাঠ্য করেছে। কিন্তু বেসরকারী স্কুলে ইংরেজীর ওয়ার্ড বুক, একটিভ ইংলিশ, এমনকি ব্যাকরণও পাঠ্য করে। শিশুশ্রেণীর একটি শিশুর যেখানে খেলায় খেলায় পড়ার কথা সেখানে তাকে বইয়ের পর বই চাপিয়ে দেয়া হয়। শিশুর জন্য একসঙ্গে বাংলা, ইংরেজী ও আরবী ভাষার অত্যাচার তো আছেই। কাকতালীয়ভাবে সেজন্য সরকারী মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণ সরকারী স্কুলের চাইতে বেশি বই পাঠ করে।

আমি মনে করি, স্কুল ব্যাগের ওজন কমানোটা সমাধান নয়। বরং এখন দুনিয়ার সর্বত্র স্কুলব্যাগ উধাও করার প্রচেষ্টা চলছে। আমরা নিশ্চিত করেই জানি যে, ডেনমার্কের স্কুলে বই দিয়ে লেখাপড়া করানো হয় না। সিঙ্গাপুরের ছেলে মেয়েরা আইপ্যাড দিয়ে পড়াশোনা করে। মালয়েশিয়ার স্মার্ট স্কুলগুলোতে কাগজের বই কোন প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গই নয়। যুক্তরাজ্যের স্কুলগুলো সম্পর্কে ৪ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখের দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবরটির অংশবিশেষ দেখেই বলা যাবে ভারি ওজনের স্কুল ব্যাগের উধাও করাটাই সমাধান।

খবরটির শিরোনাম : যুক্তরাজ্যের ৭০ শতাংশ বিদ্যালয়ে ট্যাবলেট। খবরটি এরকম : “যুক্তরাজ্যের প্রায় ৭০ শতাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ট্যাবলেট কম্পিউটার। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নতুন প্রযুক্তির সুবিধা দিতে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রযুক্তির সুবিধা নিতে ট্যাবলেট কম্পিউটার ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে যুক্তরাজ্য। আর সেজন্যই বিদ্যালয়গুলোতে ট্যাবলেট কম্পিউটার দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি এক গবেষণায় এ তথ্য জানা গেছে। গবেষণার অংশ হিসেবে ৬৭১টি বিদ্যালয়ে জরিপ চালানো হয়। বিদ্যালয়গুলোতে ট্যাবলেটের এমন ব্যবহার বাড়ার ফলে প্রযুক্তির প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ যেমন বাড়ছে তেমনি বাসা এবং বিদ্যালয়ে প্রযুক্তির নানা সুবিধা ও ব্যবহার করছে শিক্ষার্থীরা। বার্বি ক্লাক অব দ্য ফ্যামিলি, কিডস এ্যান্ড ইয়ুথ রিসার্চ গ্রুপের করা এ গবেষণায় বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যের ৬৮ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬৯ শতাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ট্যাবলেট কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি ট্যাবলেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যালয়ের বাইরে বাসায় প্রায় ৭০ শতাংশ তরুণ শিক্ষার্থী ট্যাবলেট কম্পিউটার ব্যবহার করে। শিক্ষার্থীদের ট্যাবলেট ব্যবহারের এমন হার ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বেশ সহায়তা করছে বলে জানিয়েছে গবেষক দল। যে হারে এ সংখ্যা বাড়ছে তাতে ২০১৬ সালের মধ্যে ট্যাবলেট ব্যবহারের সংখ্যা বেড়ে হবে নয় লাখ। চলতি বছরে এ সংখ্যা হলো চার লাখ ৩০ হাজার।” যুক্তরাজ্যের শিশুদের এই পরিসংখ্যান বস্তুত একটি ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থার প্রকৃত দিক নির্দেশনা প্রদান করছে।

ফোর্বসের ওয়েবসাইটে ডিজিটাল শিক্ষা নিয়ে অসাধারণ কিছু মন্তব্য পাওয়া গেছে। একটি মন্তব্য হচ্ছে ৬০০ বছর আগে জার্মানির গুটেনবার্গ ছাপাখানা আবিষ্কার করে যে ধরনের বিপ্লব সাধন করেছিলেন শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর দুনিয়াটিকে সেভাবেই বদলে দেবে। এতেই বলা হয় যে, ডিজিটাল শিক্ষা এখন আর ডিজিটাল ক্লাসরুমে স্মার্ট বোর্ড, শিক্ষামূলক খেলা বা ক্লাসরুমের রূপান্তরই নয়, বরং যেসব শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগের বাইরে তাদের জন্যও এক অনন্য সুযোগ হতে পারে।

ঢাকা, ৮ এপ্রিল, ২০১৬

লেখক : *তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস 'আবাস-এর চেয়ারম্যান, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যারের জনক ॥*

mustafajabbar@gmail.com
www.bijoyekushe.net, www.bijoydigital.com